আরক

(গল্পগ্রন্থ – নবাগত)

লাহোর মিউজিয়মে যখন চাকরি করতাম, সে সময় লাহোরের বিখ্যাত 'দেশ-বন্ধু' কাগজেরসম্পাদক বিনায়ক দত্ত সিং মহাশয়ের সঙ্গে আমার যথেষ্ট আলাপ হয়। মি. সিং প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান, তাদের আদি বাসভূমি পাঞ্জাবে নয়, রাজপুতানার কোটা রাজ্যে তিনপুরুষ পূর্বে তার পিতামহ রাজকার্য উপলক্ষে এসে পাঞ্জাবে বাস করেন, সেই থেকেই তারা দেশছাড়া।সন্ধ্যার পরে তার বৈঠকখানায় গিয়ে বসতাম এবং দেওয়ালে টাঙানো পুরানো আমলের বর্ম, কুঠার, পতাকা, বল্লম প্রভৃতি রাজপুতের যুদ্ধাস্ত্র সম্বন্ধে নানা ইতিহাস ও আলোচনা শুনতে বড়ভাল লাগতো। রাজপুতানার, বিশেষ করে কোটা রাজ্যের ইতিহাস সম্বন্ধে মি. সিংয়ের জ্ঞানখুবই গভীর।

কিন্তু এ-সকল কথা নয়, আমি একটা আশ্চর্য ঘটনা বলব। মি. বিনায়ক দত্ত সিংয়ের মতোসম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত লোকের মুখে না শুনলে আমিও এ কাহিনী হেসে উড়িয়ে দিতাম।

একদিন শীতকালে সন্ধ্যার পরে আমি মি. সিংয়ের বৈঠকখানায় গিয়ে বসেছি। ভীষণ শীতসেদিন। দু'পেয়ালা গরম চা-পানের পর তাওয়ার তামাক টানচি (মি. সিং ধূমপানে অভ্যস্ত নন)। হঠাৎ কি মনে করে জানিনে, আমি তাকে বল্লাম—মি. সিং, আপনি অপদেবতায় বিশ্বাস করেন?

মি. সিং একটু চিন্তা করে বল্লেন—হ্যাঁ, করি।

—দেখেচেন ভূত-টুত?

মি. সিং গম্ভীর সুরে বল্লেন—না, এ আমার কথা নয়, আমার ছোট ঠাকুরদাদার জীবনের ঘটনা। যদি এ ঘটনা না ঘটতো আমাদের বংশে, তবে আজও আমরা একটা রাজ্যে মস্ত বড় খানদানি তালুকদার হয়ে থাকতে পারতাম। লাহোরে এসে চাকরি করতে হত না। সে বড় আশ্চর্য ঘটনা।

আমি বল্লাম—কি রকম?

—শুনুন তবে। আমার ছোট ঠাকুরদা আমার পিতামহের আপন ভাই নন, বৈমাত্র ভাই।তিনি মস্ত বড় শৌখিন মানুষ ছিলেন—আর ছিলেন খুব সুপুরুষ।

আমি বিনায়ক দত্ত সিংয়ের দীর্ঘ, গৌরবর্ণ, বলিষ্ঠ দেহের দিকে চেয়ে সে কথা অবিশ্বাসকরতে পারলাম না।

তারপর তিনি বলে যেতে লাগলেন—আমি যখন তাঁকে দেখেচি, তখন আমার বয়স খুবকম। কিন্তু তিনি তখন বদ্ধ উন্মাদ একদম। কেন তিনি উন্মাদ হলেন, সেই ইতিহাসের মূলেই এইগল্প। তিনি উন্মাদ হওয়াতে কোটা রাজদরবারের আইন অনুসারে তার আগের সমস্ত সম্পত্তিআমাদের হাতছাড়া। সে কথা যাক গে, আসল গল্পটা বলি—

বিনায়ক দত্ত সিং তার অনবদ্য উর্দুতে সমস্ত গল্পটা বলে গেলেন। মধ্যে-মধ্যে আমি তাকেনানা প্রশ্ন করেছিলুম, সে সব বাদ দিয়ে শুধু গল্পটাই আমার নিজের ভাষায় প্রকাশ করলাম।

আমাদের গ্রাম থেকে কিছুদূরে কোটা দরবারের একটা সৈন্যদের আড্ডা ছিল। আমার ঠাকুরদাদা সেই সৈন্যদের আড্ডায় মাঝে মাঝে যেতেন—মদ খেয়ে স্ফূর্তি করতে। তারদু'একজন বন্ধু সেখানে ছিল, তাদের সঙ্গের নেশাতেই সেখানে যাওয়া। একবার জ্যোৎস্নারাত্রে তিনি আর তার দুই বন্ধু খেয়ালের মাথায় বরী নদীতে স্নান করতে যাবেন বলে ঘোড়ায় করে বেরুলেন।

বরী নদী মরুভূমির মধ্য দিয়ে তিন শাখায় ভাগ হয়ে সাবলীল গতিতে বয়ে গিয়েছে। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে তখন এই ত্রিস্রোতা নদীর প্রথম ধারাটিতে আদৌ জল ছিল না, মাঝেরশাখাটিতে হাঁটুখানেক জল, তারপর মাইলটাক বিস্তৃত চড়া—তার ওপারে আসল ধারা, অনেকখানি জল তাতে।

যাবার পথে একজন বন্ধুর কি খেয়াল হল, তিনি প্রথম ধারার বালির উপর ঘোড়া থেকে নেমে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়লেন—আর কিছুতেই উঠতে চাইলেন না। বাকি বন্ধুটি আর আমার ঠাকুরদাদা অগত্যা তাঁকে সেখানেই

বালুশয্যায় শায়িত অবস্থায় ফেলে চল্লেন এগিয়ে।বলা বাহুল্য, তিনজনের মধ্যে কেউই ঠিক প্রকৃতিস্থ অবস্থায় ছিলেন না।

আমার ঠাকুরদাদা বড় ধারা অর্থাৎ আসল বরী নদীর কাছে এসে পেছন ফিরে চেয়েদেখলেন তার বন্ধুটি ঘোড়া থামিয়ে বালির চড়ার পশ্চিম দিকে ভীত ও বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। ঠাকুরদাদা বল্লেন—ওদিকে কি দেখচ চেয়ে?

বন্ধু মুখে কিছু না বলে সেদিকে আঙুল দিয়ে দেখালে আর ইঙ্গিতে ঠাকুরদাদাকে চুপ করে থাকতে বল্লে। ঠাকুরদাদা চেয়ে দেখলেন, বালুর চড়ার ঠিক মাঝখানে অস্পষ্ট ধরনের কতকগুলিমনুষ্যমূর্তি চক্রাকারে ঘুরছে। কিছুক্ষণ চেয়ে দেখে মনে হল ওরা যেই হোক, হাত ধরাধরি করে ঘুরে ঘুরে নৃত্য করছে। সেই নির্জন স্থানে রাত্রিকালে কাদের এমন আমোদ লেগেচে যে লোকচলাচলের অন্তরালে নৃত্য করতে যাবে বুঝতে না পেরে তারা দুজনেই অবাক হয়ে চেয়েরইলেন। কাছে কেউ কেন গেলেন না, সে কথা আমি বলতে পারব না, কারণ শুনিনি। হয়তো এঁদের মত্ত অবস্থাই সব দৃশ্যটার জন্য দায়ী, এই ভেবে তারাও কাউকে কথাটা বলেননি সেইসময়।

এর পরে আরো বছর তিনেক কেটে গেল।

ত্রিস্রোতা বরী নদীর প্রধান স্রোতোধারার তিন মাইল উত্তরে মরুভূমির মধ্যে একটা বড়লবণাক্ত জলের হ্রদ আছে, এর নাম 'নাহারা নিপট' অর্থাৎ ব্যাঘ্র হ্রদ। এই হ্রদের দূরে দূরে একে প্রায় চারিদিক থেকে বেষ্টন করে পাহাড়শ্রেণী—এই পাহাড়শ্রেণী কোথাও হাজার ফুট উঁচু, কোথাও তার চেয়ে কিছু বেশি উঁচু। হ্রদ ও পাহাড় থেকে খনিজ লবণ পাওয়া যায় বলে কোটা দরবার থেকে মাঝে মাঝে এর ইজারা দেওয়া হত ব্যবসাদারদের।

আমার ঠাকুরদাদা পূর্বোক্ত ঘটনার প্রায় তিন বছর পরে একদিন এই হ্রদের জলেবালিহাঁস শিকার করতে যাবেন ঠিক করলেন। গভীর রাতের বালিহাঁসের দল হ্রদের জলেদলে দলে চরে বেড়ায়, একথা তিনি শুনেছিলেন। একটা ঘাসের লতাপাতার ছোট্ট ঝুপড়িবেঁধে তিনি তার মধ্যে লুকিয়ে থাকবেন দিনমান থেকে—কারণ মানুষ দেখলে হাঁসের দলআর নামবে না।

সব ঠিকঠাক হল, কিন্তু দু'একজন বৃদ্ধলোক নিষেধ করলে, রাত্রিকালে নাহারা হ্রদের ত্রিসীমানাতেও যাওয়া উচিত নয়। কেন, তারা স্পষ্ট করে কিছু বল্লে, না—শুধু বল্লে জায়গাটাভাল নয়। ভৈজি নামে একজন বৃদ্ধ ভীল আমাদের প্রজা ছিল, সে বল্লে—কোটা দরবারের নিমক মহালের ইজারাদার এক বেনিয়ার সে চাকর ছিল তার যৌবনবয়সে। উক্ত বেনিয়ার লবণের গুদাম আর আড়ত ছিল নাহারা হ্রদের পাড় থেকে মাইল খানেক দূরে পাহাড়ের কোলে।সে সময় সে দেখেচে হ্রদের ওপর আকাশ হঠাৎ গভীর রাত্রে যেন দিনের আলোকে আলোকিতহয়ে উঠল—কেমন যেন অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে হ্রদের জলে। মোটের উপর রাত্রে হ্রদের ধারে কেউযায় না—অনেকদিন থেকেই স্থানীয় লোকেদের মধ্যে এ ভয় রয়েছে। একবার এক মেষপালকরাত্রিকালে হ্রদের ধারে কাটিয়েছিল, সকালবেলা তাকে সম্পূর্ণ উন্মাদ অবস্থায় নিমকের গুদামের কাছে পায়চারি করতে দেখা যায়।

আমার ঠাকুরদাদা এসব গালগল্প শুনবার লোক ছিলেন না। তিনি বুঝতেন স্ফূর্তি, শিকার, হল্লা, হৈ-চৈ। লোকটাও ছিলেন দুঃসাহসী ও একগুঁয়ে ধরনের। তিনি যাবেনই ঠিক করলেন।

বৃদ্ধ ভীল তাঁকে বল্লে—হুজুর, হাঁসের দল যদি জলে নামে, তবে সেরাত্রে কোনো ভয় নেই জানবেন।

ঠাকুরদাদা জিজ্ঞেস করলেন—কিসের ভয়? বাঘের?

—তার চেয়েও ভয়ানক কোনো জানোয়ার হতে পারে—কি জানি হুজুর, আমার শোনা কথা মাত্র, ঠিক বলতে পারিনে—

—তুই সঙ্গে থাক না? বকশিশ দেব—

—মাপ করবেন, হুজুর। একশো রূপেয়া দিলেও না, রাত কাটাবে কে নাহারা নিপটের ধারে? প্রাণের ভয় নেই? আমরা ভীল, বাঘের ভয় রাখিনে—এই হাতে তীর দিয়ে কত বাঘমেরেছি, কিন্তু হুজুর, বাঘের চেয়েও ভয়ানক কোনো জীব কি দুনিয়ায় নেই?

আমার ঠাকুরদাদা নাহারা হ্রদ ভাল জানতেন না। ঠিক আমাদের অঞ্চলে হ্রদটা নয়, আমাদের গ্রাম থেকে চল্লিশ মাইল দূরে। তখনই তিনি ভীলদের গ্রাম থেকে রওনা হয়ে সাতআট মাইল হেঁটে পাহাড় ডিঙিয়ে সমতলভূমিতে নামলেন, দূরে মস্ত বড় হ্রদটার লবণাক্তজলরাশি প্রখর সূর্যতাপে চক্‌চক্‌ করচে। জনপ্রাণী নেই কোনো দিকে।

বেলা তখনো অনেকখানি আছে, এমন সময়ে ঠাকুরদাদা হ্রদের ধারে পৌঁছে গেলেন এবং নলখাগড়া ও শুকনো ঘাস দিয়ে সামান্য একটু আবরণমতো তৈরি করে নিলেন জলের ধারেই, যার আড়ালে তিনি বন্দুক নিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারেন, হাঁসের দল তাকে না টের পায়।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল—রাঙা রোদ দূরের পাহাড়ের গা থেকে মিলিয়ে গিয়েছেঅনেকক্ষণ। সুন্দর চাঁদ উঠল পুবের পাহাড় ডিঙিয়ে। কৃষ্ণপক্ষের আঁধার রাত্রি। একদল সবুজ বনটিয়া জলের ধারে নেমে আবার উড়ে গেল।

নির্জন নিস্তব্ধ মরুভূমি আর হ্রদ।

দুই দণ্ড পরে জ্যোৎস্না ফুটে উঠল হ্রদের বুকে। ধবধবে জ্যোৎস্না—কৃষ্ণা দ্বিতীয়ায় দু'দিন মাত্র আগে হেমন্তপূর্ণিমা চলে গিয়েছে। যত রাত বাড়ে, তত শীত নামে।

শীতের মুখে বালিহাঁস আসবার সময়—কিন্তু কই, একটা হাঁসও আজ নামছে না কেন?

বৃদ্ধ ভীলের কথা মনে পড়ল ঠাকুরদাদার। হাঁসের দল যদি নামে, তবে সে-রাত্রি বিপদহীন বলে জানবেন।যদি না নামে, তবে কিসের বিপদ? বাঘ জল খেতে আসে পাহাড়থেকে?

রাত্রি ক্রমে গভীর হল। অপূর্ব জ্যোৎস্নালোকে হ্রদের জল, মরুভূমির নোনা বালিরহস্যময় হয়ে উঠেছে—কোনো শব্দ নেই কোনো দিকে। ঠাকুরদাদা যথেষ্ট দুঃসাহসী হলেওতার যেন গা-ছম্‌ছম্‌ করে উঠলজ্যোৎস্নার সে ছন্নছাড়া অপার্থিব রূপে। তিনি চামড়ার বোতল বের করে কিছু আরক সেবন করলেন।

হঠাৎ হ্রদের তীরের পশ্চিমাংশে চেয়ে দেখে তাঁর মন আনন্দে দুলে উঠল।জ্যোৎস্নালোকে আকাশের নীচে একদল বালিহাঁস নামচে। জ্যোৎস্না পড়ে তাদের সাদা দুধেরমতো পাখাগুলো কি অদ্ভুত দেখাচ্চে! দেখতে দেখতে তারা নেমে এসে হ্রদের ধারে বালিরচরে বসল।

জায়গাটা ঠাকুরদাদার ঝুপড়ি থেকে দুশো গজের মধ্যে কিংবা তার চেয়ে কিছু বেশি।

এত দূর থেকে বন্দুকের পাল্লা পাবে না, বিশেষ এই জ্যোৎস্নারাত্রে। ঠাকুরদাদা ভাবলেন, দেখি ওরা কাছে আসে কিনা বা আরো হাঁসের দল নামে কিনা। শিকারীর পক্ষে ধৈর্যের মতো গুণ আর কিছু নেই। একদৃষ্টে হাঁসগুলোকে লক্ষ্য করাই ভাল। কিন্তু পরক্ষণেই ঠাকুরদাদা বিস্ময়ে নিজের চোখ বার বার মুছলেন। আরক খেয়েছেন বটে, কিন্তু তাতে জ্ঞানহারা হবার বাচোখে অত ভুল দেখবার কি কারণ আছে এখনই?

অতঃপর যা ঘটল তা বিশ্বাস করা না করা আপনার ইচ্ছা মিস্টার ব্যানার্জি, কিন্তু এ গল্প আমি বাবার মুখে অনেকবার শুনেছি—আমাদের বংশের ঘটনা—কাজেই আমি আপনাকে মিথ্যে বলচি বানিয়ে, অন্তত এইটুকু ভাববেন না। ঠাকুরদাদা দেখলেন, সেই হাঁসগুলো সাধারণ হাঁসের মতো নয়—অনেক বড়, অনেক অনেক বড়। হাঁসের মতো তাদের চালচলন নয়। তার পরেইমনে হল সেগুলো হাঁসই নয় আদপে। সেগুলো মানুষের মতো চেহারাবিশিষ্ট। বেচারিঠাকুরদাদা আবার চোখ মুছলেন। আরক ওইটুকু খেয়েই আজ আবার এ কি দশা! পরক্ষণেই সেই জীবগুলি জলে নামল এবং হাঁসের মতো সাঁতার দিয়েতিনি যেখানে লুকিয়ে আছেন, তার কাছাকাছি জলে এসে গেল। কৃষ্ণা দ্বিতীয়ার পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নাতে বিস্মিত, ভীতচকিত, দুঃসাহসী, আরক-সেবনকারী ঠাকুরদাদা দেখলেন, তারা সত্যি হাঁস নয়—একদল অত্যন্ত সুন্দরীমেয়ে! শুভ্র তাদের বেশ—জ্যোৎস্না পড়ে চিক্‌চিক করছে; তাদের হাসি, মুখশ্রী সবই

অতিঅদ্ভুত ধরনের সুন্দর। কতক্ষণ ধরে তারা নিজেদের মধ্যে খেলা করলে জলে, রাজহংসেরমতো সুঠাম ধরনে, নিঃশব্দে, সুন্দর ভঙ্গিতে হ্রদের বুকে সাঁতার দিতে লাগল। তারপর কতক্ষণপরে—তা ঠাকুরদাদার আন্দাজ ছিল না—কারণ তখন ঠাকুরদাদা সময়ের জ্ঞান হারিয়ে ফেলেচেন—ওরা সবাই জল থেকে উঠল এবং অল্প পরেই জ্যোৎস্নাভরা আকাশ দিয়ে ভেসে হাঁসের মতোই শুভ্র পাখা নেড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল—হ্রদের তীরের বাতাস তখনো তাদের অপূর্ব দেহগন্ধে ভরপুর।

আমার ঠাকুরদাদা নিজের গায়ে চিমটি কেটে দেখলেন। তিনি জেগে আছেন কিনা। তখন তাঁর আরকের নেশা ছুটে গিয়েছে। একটু পরে রাত ফর্সা হয়ে জ্যোৎস্না মিলিয়ে গেল। তিনি উদ্ভ্রান্ত মস্তিকে হ্রদের পার থেকে হেঁটে চলে এলেন পাহাড়ের কোলে। সেখান থেকেপৌঁছলেন ভীলদের গ্রামে।

বৃদ্ধ ভীল ভৈজি তাঁকে বল্লে—হুজুর, হাঁস নেমেছিল কাল?

ঠাকুরদাদা মিথ্যা কথা বললেন। হাঁস নেমেছিল, কিন্তু একটাও মারতে পারেননি।

কেন মিথ্যা বল্লেন শুনুন।

কি এক দুর্বার মোহ তাঁকে টানতে লাগল দুপুরের পর থেকেই আবার তাকে যেতে হবে, নাহারা হ্রদের তীরে রাত্রিকালে। ভৈজিকে সত্য কথা বল্লে পাছে সে বাধা দেয়।

কিন্তু সে রাত্রে বুনো বালিহাঁসের দল নামল হ্রদের জলে—আসল হাঁসের দল।

পর পর কয়েক রাত্রি শুধু বন্য-হংসের দল নামে, খেলা করে। আমার ঠাকুরদাদা ঝুপড়ির মধ্যে শুয়ে চেয়ে থাকেন, বন্দুকের গুলি করতে তাঁর মন সরে না।

তারপর আর একদিন শেষরাত্রের জ্যোৎস্নায় বন্যহংসের বদলে নামল সেই অদ্ভুতজীবের দল।

এদিন তারা আরো কাছে এল, বন্য রাজহংসের মতো সাঁতার দিয়ে বেড়াল জলজঘাসের বনের পাশে পাশে—তাদের অপূর্ব সুন্দর মুখশ্রী জ্যোৎস্নালোকে ঠাকুরদাদার মুগ্ধদৃষ্টির সম্মুখে কতবার পড়ল। রাত ভোর হবার বেশি দেরি নেই, তখনো কিন্তু জ্যোৎস্নাআছে, আমার ঠাকুরদাদা কি ভেবে, আরকের নেশায় কিংবা ভালো অবস্থায় জানিনে, ঝুপড়িথেকে উঠে ছুটে জলের ধারে চললেন। বোধ হয় ওদের কাউকে ধরতে গেলেন। অমনি ত্রস্তবন্যহংসের মতো সেই অলৌকিক জীবের দল তাড়াতাড়ি সাঁতরে কে কোথা দূরে চলে গেলএবং পরক্ষণেই শেষরাত্রের বিলীয়মান চন্দ্রালোকে তাদের লঘু দেহ ভাসিয়ে আকাশপথেঅদৃশ্য হল।

পরদিন দুপুরবেলায় আমার ঠাকুরদাদাকে উন্মাদ অবস্থায় হ্রদের ধারের বালির চড়ায়লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখে জনৈক জেলে তাঁকে ভীলদের গ্রামে পৌঁছে দেয়। বৃদ্ধ ভৈজিঘাড় নেড়ে বল্লে—আমি বলেছিলাম হাঁসের দল যেদিন না নামে, সেদিন বড় ভয়!

ঠাকুরদাদা মাঝে মাঝে ভাল হোতেন, আবার উন্মাদ হয়ে যেতেন। ভাল অবস্থায় বাড়িতেএ গল্প করেছিলেন—একবার নয়, অনেকবার। মৃত্যুর প্রায় দশ বছর আগে থেকে তার মোটেই ভাল অবস্থা আসেনি। বদ্ধ উন্মাদ অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটে।

বিনায়ক দত্ত সিং গল্প শেষ করলেন। আমি বল্লাম—খুব অদ্ভুত ঘটনা, তবে—

মি. সিং বল্লেন—তবে বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বাস করা শক্ত। সে আমিও জানি। আমাদেরদেশেও সকলে বিশ্বাস করে না। এ আজ পঞ্চাশ বছর আগেকার ঘটনা বলছি। কেউ বলে, ঠাকুরদাদার অতিরিক্ত আরক সেবনের ফলে ওই সব চোখের ভুল দেখা, বন্যহংসকে ভেবেচেন আকাশপরী; আবার কেউ বলে, না—আকাশপরী দেখলেই লোকে পাগল হয়, সেই বৃদ্ধ ভীলভৈজি সেই কথাই বলতো। কি করে বলব কোনটা সত্যি, কোনটা মিথ্যে, তখন আমার জন্মই হয়নি।